CC-1 – Indian Philosophy (ভারতীয় দর্শন) 75

1) ভূমিকা → ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখা – আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন।

2) চার্বাক দর্শন → জ্ঞানবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, নীতিবিদ্যা

3) জৈন দর্শন → দ্রব্য, গুণ, পর্যায়, অনেকান্তবাদ, স্যাদবাদ এবং সপ্তভঙ্গিনয়।

4) বৌদ্ধ দর্শন → চারটি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ, অর্থক্রিয়াকারিত্ব, ক্ষণিকত্ববাদ, নৈরাত্ম্যবাদ, চারটি শাখা,

5) ন্যায় দর্শন → প্রমা, প্রমাণ, প্রত্যক্ষ, সন্নিকর্ষ, নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষ, লৌকিক এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, ব্যাপ্তি, পরামর্শ, উপমান, স্বার্থ · পরার্থানুমান।

6) বৈশেষিক দর্শন → সাতটি পদার্থ → দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ, অভাব।

ভারতীয় দর্শন

বৈশেষিক দর্শন

প্রতিষ্ঠাতা : মহর্ষি কনাদ
প্রধান গ্রন্থ : বৈশেষিক সূত্র
শ্রেণি : আস্তিক
প্রমাণ : দুটি = (i) প্রত্যক্ষ (ii) অনুমান
পদার্থ : দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ, অভাব,

1. বৈশেষিক মতে অভাব কী? অভাবের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করো। (10)

→ (a) বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কনাদ, তাঁর 'বৈশেষিক সূত্র' গ্রন্থে ছয়টি ভাব পদার্থকে স্বীকার করেছেন। অভাব পদার্থ কে তিনি স্বীকার করেননি, তবে পরবর্তী কালে বৈশেষিক সূত্রে অন্যান্য ভাষ্য কারেরা অভাব পদার্থ কে স্বীকার করেছেন। তাদের মতে 'নভাব ইতি অভাব' অর্থাৎ যার ভাব নেই তাই হল অভাব,

● অভাবের আশ্রয় : প্রত্যেকটি অধিকারে (আশ্রয়ে) যেকোনো কোনো সময়ে কোনো কিছুর অভাব যেমন থাকে তেমনি তার জন্য বস্তুটির স্বরূপ সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান হয়, যেমন - দিনের আলোতে রাতের অভাব থাকে বলে আমরা দিনের আলোর স্বরূপকে ভালোভাবে বুঝতে পারি।

(b) অভাবের শ্রেণি বিভাগ

বৈশেষিক মতে অভাব দুই প্রকার যথা — (i) সংসর্গাভাব
(ii) অন্যোন্যাভাব

(i) সংসর্গাভাব : যখন দুটি সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে অভাব পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে সংসর্গাভাব বলে,
অর্থাৎ - প্রত্যেকটি বস্তুতে অন্য বস্তুর সংসর্গের বা সংসর্গের অভাব হলে তাকেই সংসর্গাভাব বলে।

যেমন - ফুলদানিতে ফুলের অভাব,

● সংসর্গাভাবের প্রকার ভেদ → সংসর্গাভাব তিন প্রকার হয়,
যথা — (a) প্রাগভাব (b) ধ্বংসাভাব (c) অত্যন্তাভাব

(a) প্রাগভাব : কোনো বস্তু সৃষ্টির পূর্বে তার উপাদান বস্তুটির যে অভাব তাকেই প্রাগভাব বলে।
যেমন — মাটির পাত্র সৃষ্টির পূর্বে মৃত্তিকাতে মাটির পাত্রের যে অভাব তাই হল প্রাগভাব,

প্রাগভাবের আদি বা সূত্রপাত নেই কিন্তু অন্ত বা শেষ আছে।

(b) ধ্বংসাভাব : কোনো বস্তুর ধ্বংস হয়ে গেলে তার ধ্বংসের শেষে বস্তুটির যে অভাব তাই হল ধ্বংসাভাব। মাটির পাত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে ঐ টুকরো গুলিতে মাটির পাত্রের যে অভাব তাই হল ধ্বংসাভাব। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

(c) অত্যন্তাভাব : যখন কোনো বস্তুর সঙ্গে অন্য যেকোনো বস্তুর সংসর্গ ~~অভাব~~ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোনো কালে থাকে না তাকেই অত্যন্তাভাব বলে।

যেমন — বায়ুতে রূপের অভাব।

(ii) অন্যোন্যাভাব : যখন দুটি ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে অভাব পরিলক্ষিত হয় তখন তাকেই অন্যোন্যাভাব বলে।

যেমন — টেবিল কলম নয়।

এই অভাবের আদি অন্ত কিছুই নেই।

উপরিউক্ত, অভাব পদার্থের আলোচনায় বলা যায় যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হয় তাহলে অভাব পদার্থের সাথে সাথে ভাব পদার্থকেও স্বীকার করা প্রয়োজন।

---

2. বৈশেষিক মতে কর্ম কী? কর্মের শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করো। (ব)

→ বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কণাদ, কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, যা দ্রব্যে অবস্থান করে অথচ তা কোনো গুণ নয়। এবং যা সংযোগ ও বিভাগের প্রত্যক্ষ কারণ তাই হল কর্ম, তবে দ্রব্যে গুণ ও কর্মের আশ্রয় হলেও গুণ ও কর্ম দ্রব্য থেকে ভিন্ন আবার কর্ম গুণ থেকে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র পদার্থ।

▶ কর্মের আশ্রয় : কর্ম যদিও দ্রব্যকে আশ্রয় করে তবুও সব দ্রব্যের মধ্যে কর্ম থাকে না। কর্মের অবস্থান কেবলমাত্র ~~মূর্ত~~ মূর্ত ও অসীমিত দ্রব্যকে আশ্রয় ~~করে~~ করে, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও মন মূর্ত দ্রব্য তাই এদের কর্ম আছে, দিক, কাল, আত্মা ও আকাশ অমূর্ত দ্রব্য তাই এদের

কোনো কর্ম থাকে না,

▶ **কর্ম ও গুণের পার্থক্য** : কর্ম ও গুণের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য রয়েছে, কর্ম সক্রীয় কিন্তু গুণ নিস্ক্রীয় কর্ম অস্থায়ী কিন্তু গুণ স্থায়ী। কর্ম গতিশীল কিন্তু গুণ স্থিতিশীল তবে কর্ম ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এরা উভয়ে দ্রব্যকে আশ্রয় করে বিরাজ করে,

▶ **কর্মের প্রকারভেদ** : বৈশেষিক দর্শনে কর্ম পাঁচ প্রকারের যথা- (i) উৎক্ষেপণ (ii) অবক্ষেপণ (iii) আকুঞ্চন (iv) প্রসারণ (v) গমন,

(i) **উৎক্ষেপণ** : যে কর্মের দ্বারা উপরের দ্রব্যের সঙ্গে নীচের দ্রব্যের কোনো সংযোগ স্থাপন হয় তাকেই উৎক্ষেপণ বলে, যেমন— আম পারার জন্য গাছের উপরের দিকে কোনো কিছু ছুঁড়ে দেওয়া,

(ii) **অবক্ষেপণ** : যে কর্মের দ্বারা উপর থেকে নিচের দিকে কোনো দ্রব্যকে নিক্ষেপ করা হয় তাকেই অবক্ষেপণ বলে, যেমন — ছাদ থেকে কোনো কিছুদ্রব্যকে নীচে ফেলে দেওয়া,

(iii) **আকুঞ্চন** : যে কর্মের দ্বারা কোনো দ্রব্যের বিভিন্ন অংশ গুলিকে সংকুচিত করা হয় তাকেই আকুঞ্চন বলে। যেমন— হাত মুষ্টি বদ্ধ করে হাতের আঙুল গুলিকে সংকুচিত করা,

(iv) **প্রসারণ** : যে কর্মের দ্বারা কোনো দ্রব্যের সংকুচিত অংশগুলিকে প্রসারিত করা হয় তাকেই প্রসারণ বলে। যেমন - হাতের মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ আঙুল গুলিকে প্রসারিত করা,

(v) **গমন** : গমন বলতে বোঝায় বস্তুর স্থান পরিবর্তন মূলক ক্রীয়াকে, অর্থাৎ, যে ক্রিয়া দ্বারা বস্তুর স্থানান্তর সময় হয় তাকেই গমন বলে,

বৈশেষিক দর্শনের কর্ম সম্পর্কীত আলোচনা থেকে যে সকল কর্মের পরিচয় পাওয়া গেল সেগুলি প্রত্যেক গ্রাহ্য, কিন্তু সব কর্ম প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নয়, যেমন- মনের কর্মের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না, তাই বৈশেষিক দর্শনের এই সমস্ত কর্ম গুলিকে সব ক্ষেত্রে গ্রহন করা যায় না,

③ বৈশেষিক দর্শনে স্বীকৃত দ্রব্য পদার্থটি ব্যাখ্যা করো। (5)

→ বৈশেষিক দর্শনে ৭ টি পদার্থকে স্বীকার করা হয়, যথা — দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ এবং অভাব। এর মধ্যে বৈশেষিক দার্শনিকরা দ্রব্যকে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেছেন। দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বলেছেন 'ক্রিয়াবদ্ সমবায়ী কারণম্' অর্থাৎ দ্রব্য হচ্ছে গুণ ও ক্রিয়ার আশ্রয়। দ্রব্য ছাড়া গুণ এবং ক্রিয়া থাকতে পারে না।

▲ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ

বৈশেষিক মতে গুণ ও ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কালে আমরা তাদের আশ্রয় স্বরূপ দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করে, যেমন — যখন আমরা লাল ফুল প্রত্যক্ষ করি তখন লাল রঙের সাথে সাথে ফুলটিকেও প্রত্যক্ষ করি।

▲ দ্রব্যের প্রকারভেদ

বৈশেষিক মতে দ্রব্য ৯ প্রকার — যথা —
(i) ক্ষিতি (ii) অপ (iii) তেজ (iv) মরুত (v) ব্যোম
(vi) দিক (vii) কাল (viii) আত্মা (ix) মন

(i) পঞ্চভূত : ৯ টি দ্রব্যের সবকটি জড়দ্রব্য নয়। প্রথম 5 টি জড় দ্রব্য এই ৫ টি দ্রব্যকে একত্রে বলা হয় পঞ্চভূত, পঞ্চভূতের প্রত্যেকের নিজস্ব একটি করে গুণ আছে, ক্ষিতির গুণ হল গন্ধ, অপ বা জলের বিশেষ গুণ হল রস, তেজের বা আগুনের বিশেষ গুণ হল রূপ বা বর্ণ, মরুত বা বায়ুর বিশেষ গুণ হল স্পর্শ, এবং ব্যোম বা আকাশের বিশেষ গুণ হল শব্দ, এই 5 টি মহাভূত নিত্য এবং নিরবয়ব তাই এদের উৎপত্তি নেই এবং বিনাশও নেই।

(ii) দিক : দিক পঞ্চভূতের মতোই নিত্য এবং নিরবয়ব, দিক একটি, অনেক নয়, দিক অনন্ত, খণ্ড নয়, আমরা আমাদের সুবিধার জন্য একই অখণ্ড দিককে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করি, দিক এক অতীন্দ্রিয় দ্রব্য, তাই একে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

(iii) কাল : কাল কথার অর্থ হল সময়, কাল ও দিকের মত নিত্য এবং নিরবয়ব, আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এক

অসংখ্য কণাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করি, কাল অতীন্দ্রিয় দ্রব্য, তাই একেতে প্রত্যক্ষ করা যায় না,

iv) আত্মা : আত্মা ২ প্রকার, যথা — (i) জীবাত্মা এবং (ii) পরমাত্মা উভয় আত্মা নিত্য এবং নিরবয়ব, জীব আত্মার জ্ঞান অনিত্য, কিন্তু পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, তাই আমাদের পরমাত্মাই বিশ্বাস করা উচিত।

(v) মন : মন নিত্য ও অণু পরিমাণ দ্রব্য যা হচ্ছে অন্তর ইন্দ্রিয়, তার দ্বারাই আমরা সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। মন আমাদের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান দানে সাহায্য করে।

বৈশেষিক দর্শনের দ্রব্য সম্বন্ধীয় আলোচনায় বোঝা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটি দ্রব্য যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারলে জীব আত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। তাই জীব আত্মা থেকেই পরমআত্মাই উন্নীত হওয়া জন্য দ্রব্য গুলির জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা আছে,

---

(A) বৈশেষিক মতে বিশেষ পদার্থটি ব্যাখ্যা করো? (5)

→ বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' নামে একটি ভাব পদার্থ স্বীকৃত হয়েছে যা কোনো কিছুকে অন্য বিষয় থেকে পৃথক করে তাই হল বিশেষ পদার্থ, বিশেষ হল সামান্যের বিপরীত, সাধারণত আমরা ভেদ সূচক পদার্থকে বিশেষ বলে থাকি, এই ভেদ সূচক পদার্থ গুলি হল - (i) ক্ষিতি (ii) অপ, (iii) তেজ (iv) মরুৎ, এই চারটি দ্রব্যের মধ্যে অসংখ্য পরমাণু বিদ্যমান থাকে, এই পরমাণুগুলির মধ্যে যে ভেদ আছে তাকে প্রমাণ করার জন্য যে পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাকেই 'বিশেষ' বলা হয়,

▸ বিশেষ পদার্থের লক্ষণ : বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ পদার্থের লক্ষণ প্রকাশ করে বলা হয়েছে যা নিত্য দ্রব্যের স্বকীয় পার্থক্য রীতি করে তাই হল বিশেষ পদার্থ। সামান্য পদার্থ জাতিগত পার্থক্য নির্দেশ করে কিন্তু ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না, তাই ব্যক্তিগত পার্থক্য নির্দেশ

পদার্থ হিসাবে বিশেষকে প্রয়োজন হয়।

▶ (ট) বিশেষের বৈশিষ্ট্য : বিশেষ নিজেই নিজের ভেদ হিসাবে ব্যক্ত করে তাই বিশেষের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, তাই বিশেষকে জানতে বা বুঝতে হলে অবশ্যই সামান্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের প্রয়োজন আছে।

▶ (ঠ) বিশেষের ধর্ম : বৈশেষিক দর্শনের অনন্ত বিশেষ স্বীকৃতি হলেও অনন্ত বিশেষের কোনো সার্বিক ধর্ম বা সামান্য ধর্ম স্বীকৃত হয়নি তাই বৈশেষিক গণ বলেন বিশেষকে কখনোই সার্বিক ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ এর সমস্ত বৃত্তি বিশেষ।

▶ বিশেষের প্রমাণ : বিশেষ পদার্থ অনুমান সিদ্ধ বিশেষের অসংখ্য, প্রমাণের অনুমান প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণকে স্বীকার করা যায় না তাই বিশেষ নামক পদার্থকে অনুমান প্রমাণের দ্বারা পাওয়া বলে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে সেই পদার্থটি বিভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়।

▶ বিশেষের আশ্রয় : বিশেষ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ কারণ এর্থে সর্বদা আশ্রয় রূপে গণ্য হলেও বিশেষ সর্বদা একটি আশ্রিত পদার্থ, বিশেষ কারও আশ্রয় পদার্থ নয়, তাই বিশেষকে বৈশেষিক দর্শনে অতিরিক্ত পদার্থ হিসাবে স্বীকার করা হয়।

▶ সামান্য ও বিশেষের পার্থক্য : বিশেষ পদার্থের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে বিশেষকে সামান্য পদার্থ থেকে আলাদা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সামান্য ও বিশেষের মধ্যে যে কতকগুলি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল —

(I) সামান্য একটি পদার্থের অনুগত ধর্ম,

অপরের পক্ষে বিশেষ হল একটি অবচ্ছিন্ন ধর্ম।

(II) সামান্য এক,

অপরের পক্ষে বিশেষ বহু,

(III) সামান্য একত্রীকরণ প্রক্রিয়া,

অপর পক্ষে বিশেষ পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া

বৈশেষিক দর্শনের বিশেষ পদার্থ আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ পদার্থ বহু রূপে উপস্থিত থেকে দুটি ভিন্ন পদার্থের মধ্যে পৃথকীকরণ সমন্বয় করতে পারে তাই বিশেষ পদার্থকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

জৈন দর্শন

প্রতিষ্ঠাতা : মহাবীর
শ্রেণী : নাস্তিক (নিরীশ্বরবাদী)
সম্প্রদায় : দুটি — (i) শ্বেতাম্বর (ii) দিগম্বর
প্রধান গ্রন্থ : জৈন আগমসূত্র
প্রমাণ : তিনটি (i) প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান

জৈনদের উৎপত্তি : 'জিন' শব্দ থেকে জৈন শব্দের উৎপত্তি, জিন শব্দের মূলে যে 'জি' ধাতু তার অর্থ হচ্ছে জয় করা, ব্যুৎপত্তি জিন বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তিকে যিনি আত্মজ্ঞান দ্বারা কামনা বাসনাকে জয় করে মুক্ত পুরুষ রূপে অবস্থান করেন। অর্থাৎ জিন হচ্ছে সিদ্ধ পুরুষ জিনদের তীর্থঙ্কর বলা হয়, তীর্থঙ্কর কথার অর্থ সত্যের পথপ্রদর্শক

→ আপ্ত ব্যক্তি বা বিশ্বাসভাজন ব্যক্তির মুখনিঃসৃত বা লিখিত বাক্য থেকে যে জ্ঞান হয় তাকে শ্রুতি বলে।

① জৈন দর্শনের সপ্ত ভঙ্গি নয় তত্ত্বটি আলোচনা করো।

→ জৈন গণ দুই প্রকার অবধারণ (বিচার) বা নয়ের কথা বলেছেন যথা সদর্থক অবধারণ এবং নঞর্থক অবধারণ। এই দুই অবধারণ কে সংযুক্ত করে 'স্যাৎ' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে। স্যাৎ কথার অর্থ হল আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। প্রতিটি অবধারণ যে আংশিক সত্য তা বোঝাবার জন্য প্রত্যেক অবধারণের পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।

সপ্ত ভঙ্গি নয়: জৈন দার্শনিক গণ ৭ টি 'নয়' স্বীকার করেন। সেগুলিকে একত্রে সপ্ত ভঙ্গি নয় বলা হয়। সেগুলি হল —

① স্যাৎ অস্তি
② স্যাৎ নাস্তি
③ স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ,
④ স্যাৎ অবক্তব্যম্ (অপ্রকাশিত)
⑤ স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম
⑥ স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম্
⑦ স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ অবক্তব্যম।

① স্যাৎ অস্তি: নয়ের এই রূপটি সাধারণ সদর্থক অবধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন একটি কোনো কিছুকে আপেক্ষিক ভাবে সদর্থক বলে প্রকাশ করতে হয় তখন তাকে স্যাৎ অস্তি বলে, যেমন - আপেক্ষিক ভাবে একটি ফুল লাল।

② স্যাৎ নাস্তি: নয়ের এই রূপটি সাধারণ নঞর্থক অবধারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন কোনো বিষয়কে নঞর্থক বলে প্রকাশ করতে হয় তখন তাকেই বলা হয় স্যাৎ নাস্তি যেমন আপেক্ষিক ভাবে

একটি ফুল লাল নয়।

(3) স্যাৎ অস্তি-নাস্তি চ : যখন কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে একটি বিষয়কে সদর্থক এবং নঞর্থক উভয় রূপে প্রকাশ করতে হয় তখন তাকেই বলা হয় স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ। যেমন - আপেক্ষিক ভাবে একটি ফুল লাল এবং লাল নয়।

(4) স্যাৎ অব্যক্তম : যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় মাটির পাত্রের রং কী? আমরা এক কথায় প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি না। কারণ একটি মাটির পাত্র কে না পোড়ালে তার রং হয় কালো। আবার পাত্রটিকে পোড়ালে তার রং হয় লাল। সুতরাং মাটির পাত্রের রং সঠিক ভাবে বলা যায় না। তখন বলতে হয় আপেক্ষিক ভাবে ঘটটি অব্যক্ত।

(5) স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তম : যখন প্রথম ও চতুর্থ অবধারণের বা নয়ের সংমিশ্রণ ঘটে তখন তাকে স্যাৎ অস্তি চ অব্যক্তম বলে। যেমন - আপেক্ষিক ভাবে একটি ফুল লাল ও অব্যক্তম।

(6) স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তম : যখন দ্বিতীয় ও চতুর্থ অবধারণের বা নয়ের সংমিশ্রণ ঘটে তখন তাকে স্যাৎ নাস্তি চ অব্যক্তম বলে। যেমন - আপেক্ষিক ভাবে একটি ~~ফুল লাল বা~~ লাল নয়, অব্যক্তম

(7) স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ অব্যক্তম : যখন তৃতীয় ও চতুর্থ অবধারণের বা নয়ের সংমিশ্রণ ঘটে তখন তাকে স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ অব্যক্তম বলে। যেমন - আপেক্ষিক ভাবে একটি ফুল লাল, লাল নয় এবং অব্যক্তম।

জৈন স্যাৎবাদকে বা সপ্তভঙ্গী নয় কে পাশ্চাত্য দর্শনেও স্বীকার করা হয়েছে। কারণ আমাদের সমস্ত জ্ঞানই আংশিক সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে।

② জৈন দর্শনের পঞ্চমহাব্রত আলোচনা করো?

→ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি হল জৈন নীতি শাস্ত্র সম্মত পঞ্চব্রত যা মুক্তিকামী প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য পালনীয় মঠ বাসী সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে এই পাঁচটি ব্রত কঠোর ভাবে পালনীয় হওয়াই তাদের ক্ষেত্রে এই পাঁচটি ব্রত পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত। এই পাঁচটি মহাব্রতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে করা হল, —

① অহিংসা : পঞ্চমহাব্রতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত হল অহিংসা, অহিংসা 'পরমধর্ম:', অন্য চারটি ব্রত অহিংসা ব্রতেরই অঙ্গ স্বরূপ। কায়, মন ও বাক্যে অহিংসা হতে হবে, কায়িক ভাবে, মানসিক ভাবে এবং বাচিক ভাবে কোনো জীবের ক্ষতি না করা, ক্ষতির চিন্তা না করা ক্ষতিকর কথা না বলাই অহিংসা, এই ত্রিপ্রকার অহিংসাকে বলা হয় 'ত্রিগুপ্তি'। অহিংসা দ্বারাই কেবল সব কে জয় করা সম্ভব হয়।

② সত্য : জৈন মতে সত্যকে সুনৃত বলা হয়, সুনৃত বলতে বোঝায় উপাদেয় ও উপকারি। যা উপাদেয় ও উপকারি তাই সত্য মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকলেই সত্যব্রত পালন হয় না, মিথ্যাকে পরিহার করে সত্য কথন, হিত কথন ও প্রিয়কথনই হচ্ছে সত্য ব্রত।

③ অস্তেয় : ছলে, বলে বা কৌশলে অপরের সম্পদ গ্রহণ করা বা অধিকার করা হচ্ছে স্তেয়, আর চাতুরি বা বল পূর্বক অপরের সম্পদ গ্রহণ না করা বা অধিকার না করা হচ্ছে অস্তেয়, জৈনরা বলেন আনন্দ দান ব্যতিত যেকোনো অবস্থাতেই অপরের সম্পদ গ্রহণ না করায় হল অস্তেয়।

④ ব্রহ্মচর্য : কাম, দমন এরই হল ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মচর্য বলতে সাধারণত বোঝায় কাম ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা জৈন নীতি শাস্ত্রে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ব্যবহারে অর্থাৎ সর্ববিধ ভোগের ব্যাপারে কঠোর সংযম। এই ব্রত পালনের দ্বারাই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

⑤ অপরিগ্রহ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় না করায় হল অপরিগ্রহ ব্রত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করলেই দরিদ্রকে তার সম্পদ থেকে এবং ক্ষুধার্তকে তার খাদ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়, যা হিংসারই নামান্তর। তাই অহিংস হতে গেলেই অপরিগ্রহ ব্রত পালন একান্ত প্রয়োজনীয়।

(৩) জৈন স্যাদ বাদ তত্ত্বটি আলোচনা করো। (4)

→ জৈন দার্শনিক মতে 'অনন্ত ধর্ম কর্ম বস্তু' অর্থাৎ বস্তুর অনন্ত ধর্ম তার কর্মের মধ্যে থাকে। একমাত্র সর্বজ্ঞ ব্যক্তি তার জ্ঞানের মাধ্যমে বস্তুর অনন্ত ধর্মকে জানতে পারেন। কিন্তু আমাদের মতো সসীম জীবের পক্ষে বস্তুর অনন্ত ধর্মকে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আংশিক ও সীমিত। বস্তুর এই আংশিক জ্ঞানকে 'স্যাদ' বা 'নয়' বলা হয়।

দৃষ্টান্ত : জৈন দার্শনিকরা প্রসঙ্গে ছয় জন অন্ধ ব্যক্তি ও তাদের চিড়িয়াখানা ভ্রমণের কাহিনি বর্ণনার মাধ্যমে স্যাদ বাদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছেন। অন্ধ ব্যক্তিরা চিড়িয়াখানায় গিয়ে একটি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে তাদের আংশিক জ্ঞানের ভিত্তিতে হাতির বর্ণনা দিয়েছিল। অর্থাৎ আংশিক জ্ঞান সংযুক্ত করলে একটি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান তৈরি হয়, একেই বলা হয় স্যাদ।

স্যাদবাদ : জৈন দার্শনিকদের মতে বস্তু সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কখনোই সম্পূর্ণ রূপে সত্যও নয় আবার সম্পূর্ণ রূপে মিথ্যাও নয়। সুতরাং আমাদের বস্তু বিষয়ক জ্ঞান আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। এই সত্য মিথ্যার আংশিক রূপকে প্রকাশ করার জন্য যে মতবাদ গঠিত হয়েছে তাকেই বলা হয় স্যাদ বাদ।

স্যাদবাদের ব্যবহারিক দিক : জৈন দার্শনিকদের মতে যেহেতু আমরা ব্যবহারিক জীবনে একটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোনো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি। তাই আমাদের জ্ঞান কখনোই সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটি মুক্ত হয় না। তাই জৈন স্যাদ বাদ আমাদের কাছে ব্যবহার যোগ্য।

স্যাৎ বাদের প্রকারভেদ : জৈন দার্শনিকদের মতে স্যাৎ শব্দটি আমাদের সামনে ৭ রকম ভাবে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ স্যাৎ বাদ ৭ প্রকার, যথা —

(i) স্যাৎ অস্তি
(ii) স্যাৎ নাস্তি
(iii) স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ,
(iv) স্যাৎ অবক্তব্যম
(v) স্যাৎ অস্তি চ অবক্তব্যম
(vi) স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যম
(vii) স্যাৎ অস্তি নাস্তি চ অবক্তব্যম

সমালোচনা : **প্রথমত**: বৌদ্ধ ও বেদান্ত দার্শনিকদের মতে স্যাৎ বাদ স্ববিরোধী মতবাদ, কারণ এই মতবাদ একই বস্তুতে দুটি বিরুদ্ধ গুণের অবস্থান স্বীকার করে। তাই এটি গ্রহণ যোগ্য নয়,

দ্বিতীয়ত : বেদান্ত দার্শনিকদের মতে যদি সবকিছু আপেক্ষিক হয় তাহলে স্যাৎ বাদও আপেক্ষিক হবে। অর্থাৎ স্যাৎ বাদও সম্পূর্ণ সত্য নয়, বরং আংশিক সত্য। তাই এই মতবাদ সবক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্য নয়,

---

ন্যায় দর্শন

① প্রতিষ্ঠাতা - মহর্ষি গৌতম

② শ্রেণি - আস্তিক

③ প্রমাণ - চারটি - (i) প্রত্যক্ষ (ii) অনুমান (iii) উপমান (iv) শব্দ

④ প্রধান গ্রন্থ - ন্যায় সূত্র,

⑤ প্রধান ভাষ্যকার - বাৎস্যায়ন

⑥ অপর নাম - আন্বীক্ষিকী

⑦ প্রধান বিষয় - প্রত্যক্ষ, অনুমান

① ন্যায় দর্শনকে আন্বীক্ষিকী দর্শন বলা হয় কেন? (অনু + ঈক্ষা) পরে ফিরে দেখা

→ ন্যায় দর্শন অন্যান্য সকল দর্শনের সমস্ত শাস্ত্রকে বিচার পূর্বক আলোচনা করেছে তাই ন্যায় দর্শনকে আন্বীক্ষিকী দর্শন বলা হয়।

② ন্যায় সূত্র সর্বশাস্ত্র প্রদীপ বলা হয় কেন?

→ ন্যায় দর্শনের প্রধান গ্রন্থের 'ন্যায় সূত্র' এই গ্রন্থের উপর নির্ভর করে তৎকালীন সমস্ত শাস্ত্র রচিত হত, অর্থাৎ এই গ্রন্থটি সমস্ত শাস্ত্রের কাছে ছিল প্রদীপ স্বরূপ তাই ন্যায় সূত্রকে সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ বলা হয়।

③ ন্যায় মতে প্রত্যক্ষ কী? প্রত্যক্ষের লক্ষণ গুলি বিশ্লেষণ করো?

→ (ন্যায় দার্শনিকদের মতে যখন কোনো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোনো বিষয়ের সংযোগ ঘটে তখন তা থেকে যখন জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকেই প্রত্যক্ষ বলে। ন্যায় দর্শনে প্রত্যক্ষ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়, একটি প্রত্যক্ষ প্রমাকে বোঝাতে এবং আরেকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণকে বোঝাতে। এখানে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমার লক্ষণ বিশ্লেষণ করব।)

(a) প্রত্যক্ষের লক্ষণ: ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষের লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি সূত্রের অবতারণা করেছেন, সেটি হল 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যম্ অব্যভিচারী ব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষম্' ।।

উপরিউক্ত শ্লোকটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এর ছয়টি লক্ষণ পেয়ে থাকি সেগুলি হল — (i) ইন্দ্রিয় (ii) অর্থ (iii) সন্নিকর্ষ (iv) অব্যাপদেশ্য (v) অব্যাভিচারী (vi) ব্যাবসায়াত্মক, নিম্নে এই ছয়টি লক্ষণ আলোচিত হল

(1) ইন্দ্রিয় : ন্যায় দর্শনে ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করা হয়, যথা- চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং মন, এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি বাহ্য ইন্দ্রিয় ও মন অন্তরইন্দ্রিয়, এদের দ্বারা যথাক্রমে বাহ্য প্রত্যক্ষ এবং মানস প্রত্যক্ষ হয়,

(2) অর্থ : 'অর্থ' শব্দের অর্থ হল যোগ্য বিষয়, যে ইন্দ্রিয় যে বিষয়কে গ্রহন করতে পারে তাকেই বলা হয় ঐই ইন্দ্রিয়ের যোগ্য বিষয় বা অর্থ, যেমন - চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যোগ্য বিষয় হল দেখা,

(3) সন্নিকর্ষ : সন্নিকর্ষ শব্দের অর্থ হল সংযোগ, যখন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ~~বিষ~~ অর্থের বা বিষয়ের সংযোগ ঘটে তখন তাকেই সন্নিকর্ষ বলে, এই সন্নিকর্ষ থেকেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়,

(4) অব্যাপদেশ্য : যে জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর শীল তাকেই বলা হয় ব্যাপদেশ্য। এবং যে জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর শীল নয় তাকে অব্যাপদেশ্য ও বলে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই পূর্বজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হয় না, তাই তা অব্যাপদেশ্য,

(5) অব্যাভিচারী : যে জ্ঞানের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাকে বলা হয় ব্যাভিচারী, এবং যে জ্ঞানের ব্যাপারে মনের সন্দেহ থাকে না তাকেই বলা হয় অব্যাভিচারী। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ব্যাপারে কারো মনে কোনো সন্দেহ থাকে না তাই তা অব্যাভিচারী,

(6) ব্যাবসায়াত্মক : ব্যাবসায়াত্মক কথার অর্থ হল সুনিশ্চিত জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কখনই অনিশ্চিত হয় না সর্বদা সুনিশ্চিত হয় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যাবসায়াত্মক,

উপরিউক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ আলোচনা থেকে বলা যায় যদি কোনো বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হয় তাহলে উপরিউক্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ গুলি সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন,

4) ন্যায় মতে ব্যাপ্তি কী ? ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায়গুলি আলোচনা কর ?

→ ব্যাপ্য = ধূম (ধোঁয়া) ব্যাপক = বহ্নি (আগুন)

ব্যাপ্তি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল বিস্তৃতি যা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাই হল ব্যাপ্তি, একটি বস্তু আর একটি বস্তুতে ব্যাপ্ত একথার অর্থ হল একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে নিয়ত অনুগমন করে, যে অনুগমন করে তাকে বলা হয় ব্যাপক। আর যাকে অনুগমন করে তাকে বলা হয় ব্যাপ্য, এই ব্যাপ্য এবং ব্যাপকের সম্পর্কই হল ব্যাপ্তি।

যেমন - ধূম ও বহ্নির সম্পর্ক হল ব্যাপ্তি সম্পর্ক।

(i) ব্যাপ্তির লক্ষণ : মহর্ষী গৌতম ব্যাপ্তির ~~ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে~~ লক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন 'সাহচার্য নিয়ম ইতি ব্যাপ্তি'; সাহচার্য কথার অর্থ হল সহঅবস্থান এবং নিয়ম কথার অর্থ হল নিয়মিত ও ব্যাতিক্রমহীন, অর্থাৎ যাদের মধ্যে নিয়মিত ব্যাতিক্রম হীন সহঅবস্থান সম্পর্ক আছে ~~আছে~~ সেটিই হল ব্যাপ্তি সম্পর্ক।

(ii) ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় : মহর্ষী গৌতম ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি উপায়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা —

(a) অন্বয় : অন্বয় কথার অর্থ হল সাদৃশ্য বা উপস্থিতি যখন আমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বা একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তখন তাকে অন্বয় বলে।

যেমন — ধূম যেখানে বহ্নি সেখানে।

(b) ব্যাতিরেক : ব্যাতিরেক কথার অর্থ হল বৈসাদৃশ্য বা অনুপস্থিতি যখন আমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে একত্র অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে তাকে ব্যাতিরেক বলে।

যেমন - যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূম নেই।

(c) ব্যাভিচারাগ্রহ : যখন আমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে একত্র উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি উভয়ই লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি তাকে ব্যাভিচারাগ্রহ বলে,

যেমন — যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি এবং যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূম নেই।

(৩) উপাধিনিরাস : ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক সময় মনের মধ্যে সন্দেহ থেকে যায়, সেই সন্দেহকে দূর করার জন্য দুটি বস্তুর সহ অবস্থানকে বারবার প্রত্যক্ষ করতে হয় এই পদ্ধতিকেই উপাধিনিরাস বলা হয়।

(৪) তর্ক : মূল বিষয়কে সত্য প্রমাণের জন্য এবং মূল বিষয়ের বিরুদ্ধ বচনকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য যে যুক্তি দেখানো হয় তাকেই তর্ক বলে, এটিও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পদ্ধতি।

(৫) সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ : যখন আমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে সমস্ত বিষয়ে সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করি তখন তাকেই বলা হয় সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ।

উপরিক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় যদি দুটি বিষয় সম্পর্কে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করতে হয় তাহলে অবশ্যই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় গুলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

---

(২) নিরবিকল্পক প্রত্যক্ষ কাকে বলে? সবিকল্পক কাকে বলে? এদের মধ্যে পার্থক্য লেখ? নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকারের পক্ষে যুক্তি দাও?

→ নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ : যে প্রত্যক্ষ কেবলমাত্র বস্তুর অস্তিত্বের জ্ঞান হয় কিন্তু গুণের জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ কোনো বিকল্প উপস্থিত থাকে না তাকেই বলা হয় নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ।

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ : যে প্রত্যক্ষ বস্তুর অস্তিত্বের সাথে সাথে তার নাম, জাতি ও গুণের জ্ঞান হয় অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ কোনো না কোনো বিকল্প উপস্থিত থাকে তাকেই বলা হয় সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

পার্থক্য

প্রথমত : নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ একটি ছাড়া আর কোনো বিকল্প উপস্থিত থাকে না, (নি + বিকল্প) = নির্বিকল্প।

অপরপক্ষে, সবিকল্প প্রত্যক্ষ একটিকে বাদ দিয়েও অন্য অনেক বিকল্প উপস্থিত থাকে, (স + বিকল্প) = সবিকল্প।

দ্বিতীয়ত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ বস্তুকেই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, অর্থাৎ এটি প্রথম ~~প্রত্যক্ষ~~ প্রত্যক্ষ।

অন্যদিকে, সবিকল্প প্রত্যক্ষকে ভাষায় প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ এটি দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ।

তৃতীয়ত নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ সর্বদাই বস্তুর আকার বা অস্তিত্ব ~~ও তার নাম~~ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে অক্ষম হয়।

অন্যদিকে,
সবিকল্প প্রত্যক্ষ বস্তুর আকার বা অস্তিত্ব ছাড়াও তার নাম, জাতি বা গুণেরও জ্ঞান দান করতে সক্ষম।

নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকারের পক্ষে যুক্তি

সমালোচনা নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে স্বীকার করতে চাননি, তবে ন্যায় দার্শনিকগণ নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকারের পক্ষে দুটি যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি হল —

(i) সমালোচক গণ বলেন — যেকোনো মনের ভাব যখন ভাষায় প্রকাশ পায় তখন তাকে জ্ঞান বলে, কিন্তু নির্বিকল্প প্রত্যক্ষকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই তাকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

এই অভিযোগের উত্তরে ন্যায় দার্শনিক গণ বলেন যে সব জ্ঞানকে সব জ্ঞানকে ভাষায় প্রকাশিত হতে হবে। একথা ঠিক নয় কারণ নির্বোধ ব্যক্তির ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও তার জ্ঞান আছে, তাই এই প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা উচিত।

ii) সমালোচক গণ বলেন বস্তুকে আমরা জানি তার গুণের মাধ্যমে কিন্তু নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ তার গুণের জ্ঞান হয় না, তাই তাকে স্বীকার করার কোনো যুক্তি নেই,

এই উত্তরে ন্যায় দার্শনিকগণ বলেন বস্তুর গুণকে জানার আগে তার অস্তিত্বকে জানতে হয় তাই নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ স্বীকার করা উচিত।

মন্তব্য

~~উপরিউক্ত~~ উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যদি কোনো বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান করতে হয় তাহলে অবশ্যই নির্বিকল্প এবং সবিকল্প প্রত্যক্ষ উভয়েই প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করা উচিত।

⑥ অনুমান কী? অনুমান কয় প্রকার ও কী কী? পরার্থানুমানের অবয়ব গুলি আলোচনা করো?

→ ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষী গৌতম ~~গুরু~~ অনুমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যা পক্ষ, সাধ্য, এবং হেতু দ্বারা গঠিত হয় তাকেই অনুমান বলে,

① প্রকারভেদ

ন্যায় মতে অনুমান দুই প্রকারের যথা — (i) স্বার্থানুমান
(ii) পরার্থানুমান

স্বার্থানুমান : স্ব + অর্থ + অনুমান = স্বার্থানুমান, অর্থাৎ নিজের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যে অনুমান সম্পন্ন করা হয় তাকেই স্বার্থানুমান বলে,

পরার্থানুমান : পর + অর্থ + অনুমান = পরার্থানুমান, অর্থাৎ অপরের জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্য যে অনুমান সম্পন্ন করা হয় তাকেই পরার্থানুমান বলে,

② পঞ্চাবয়বী ন্যায় : পরার্থানুমানে অপর নাম পঞ্চাবয়বী ন্যায়, পরার্থানুমান পাঁচটি অবয়ব বা বাক্য দ্বারা গঠিত হয় তাই পরার্থানুমানকে পঞ্চাবয়বী ন্যায় বলা হয়,

③ দৃষ্টান্ত : মহর্ষী গৌতম পঞ্চাবয়বের উল্লেখ করার জন্য একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন সেটি হল —

① প্রতিজ্ঞা → পর্বতটি বহ্নিমান — (পক্ষ - পর্বত)
② হেতু → যেহেতু পর্বতটি ধূমবান (সাধ্য – বহ্নি)
③ উদাহরণ → যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি, (হেতু - ধূম)
④ উপনয় → পর্বতটিতে বহ্নি এবং ধূম আছে,
⑤ নিগমন → অতএব পর্বতটি বহ্নিমান,

প্রতিজ্ঞা : বক্তা যে বাক্যে কোনো কিছুকে প্রমাণ করার জন্য উপস্থাপিত করেন সেই বাক্যকেই বলা হয় প্রতিজ্ঞাবাক্য, এখানে পক্ষের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ নির্দেশ করা হয় উক্ত উদাহরণে পর্বত হল পক্ষ এবং বহ্নি হল সাধ্য,

হেতু : যার দ্বারা কোনো কিছুকে প্রমাণ করা হয় তাকেই বলা হয় হেতু, উক্ত উদাহরণে ধূম হল হেতু কারন এর দ্বারা সাধ্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়,

উদাহরণ : যে বাক্য সম্বন্ধের সন্দেহ কে দূর করার জন্য উদাহরণ প্রস্তুত করা হয় সেই বাক্যকেই উদাহরণ বাক্য বলে, এখানে উদাহরণ বাক্যের দ্বারা হেতু এবং সাধ্যেই সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে,

উপনয় : যে বাক্যে পক্ষ, সাধ্য এবং হেতু উভয়ে উপস্থিত থাকে সেই বাক্যকে উপনয় বাক্য বলে। উক্ত উদাহরণে সাধ্য - বহ্নি, পক্ষ - পর্বত এবং হেতু - ধূম, উপস্থিত আছে।

নিগমন : নিগমন কথার অর্থ হল সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা বাক্যের যা প্রমানের জন্য উত্থাপিত হয়েছিল তা সিদ্ধান্ত বাক্যে বা নিগমন বাক্যে প্রমানিত হল।

মন্তব্য নিজে লাভ করা জ্ঞান যখন অপরের কাছে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তখন তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপরিউক্ত পাঁচটি অবয়ব বাক্যকে সমক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাই ন্যায় দর্শনে পঞ্চাবয়বী ন্যায় যুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান।

(৪) হেত্বাভাস কাকে বলে বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস আলোচনা করো।

→ ন্যায় দর্শনে হেতুর দোষকে হেত্বাভাস বলা হয়। অর্থাৎ যা বাস্তবে হেতু নয় বরং হেতুর আভাস মাত্র তাকেই বলা হয় হেত্বাভাস। ন্যায় দার্শনিকেরা বলেছেন যা প্রকৃত হেতু নয় অথচ হেতুর মত মনে হয় তাকেই হেত্বাভাস বলে।

হেত্বাভাসের প্রকারভেদ : হেত্বাভাস ৫ প্রকারের যথা —

(i) সব্যভিচার হেত্বাভাস
(ii) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস
(iii) সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস
(iv) অসিদ্ধ হেত্বাভাস
(v) বাধিত হেত্বাভাস।

(i) সব্যভিচার হেত্বাভাস : কোনো একটি পক্ষে থাকার নিয়মের অভাবকে সব্যভিচার বলা হয়, যেহেতু কোনো একপক্ষে ~~অব্যা~~ অব্যভিচারি রূপে থাকে না উভয় পক্ষে ব্যাভিচারি রূপে বিদ্যমান থাকে তাকেই সব্যভিচার হেত্বাভাস বলে। যেমন — 'যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি', এই নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যে দোষ ঘটে তাকেই সব্যভিচার হেত্বাভাস বলে।

সব্যভিচার হেত্বাভাস তিন প্রকারের - যথা—
(i) সাধারণ (ii) অসাধারণ (iii) অনুপসংহারি।

(ii) বিরুদ্ধ হেত্বাভাস : যে হেতু স্বীকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী তাকে বলা হয় বিরুদ্ধ হেত্বাভাস হেতুর কাজ হল সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করা, কিন্তু এক্ষেত্রে হেতুটি সাধ্যের বিরোধী হওয়ায় হেতুর দ্বারা সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণ না হয়ে সাধ্যের ~~অভাবই~~ অভাবই প্রমাণিত হয়। তাই একে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়। যেমন — যা কিছু উৎপত্তি শীল তাই নিত্য
শব্দ উৎপত্তিশীল
∴ শব্দ নিত্য।

(iii) সৎপ্রতিপক্ষ : সৎ কথার অর্থ হল সাধ্য, এবং প্রতিপক্ষ কথার অর্থ হল বিরোধী ~~হেতু~~ 'সৎপ্রতিপক্ষ হেতু' এর অর্থ হল — বিরোধী হেতুর বিদ্যমান থাকা। অর্থাৎ নিজের পক্ষের হেতুর এবং প্রতিপক্ষের হেতু যদি সমান (ক্ষমতাশালী) হয় তাহলে তাকেই সৎপ্রতিপক্ষ

হেত্বাভাস বলে, এখানে নিজের পক্ষের হেতু দ্বারা সাধ্যের অস্তিত্ব যেমন প্রমাণিত হয় তেমনই প্রতিপক্ষের হেতুর দ্বারাও সেই সাধ্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

(iv) অসিদ্ধ হেত্বাভাস : যে অনুমানে হেতুতে সাধ্যের উপস্থিতি সিদ্ধ না হয়ে কল্পিত হয় তাকেই অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলা হয়, অর্থাৎ হেতু যদি সাধ্যের মত অসিদ্ধ হয় তাহলে সেই হেতুকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস বলে গণ্য করা হয়।

এই হেত্বাভাস তিন প্রকার যথা—
(i) আশ্রয় সিদ্ধি (ii) স্বরূপাসিদ্ধি (iii) ব্যাপ্যতা সিদ্ধি,

(v) বাধিত হেত্বাভাস : যখন কোনো প্রমাণের দ্বারা কোনো সাধ্যের অভাব প্রমাণ করা যায় তখন সেই অনুমানে ব্যবহৃত হেতুকে বাধিত হেত্বাভাস বলে, অর্থাৎ কোনো অনুমানের সিদ্ধান্ত যদি অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা ভ্রান্ত রূপে প্রতিপন্ন হয় তখন তাকে বাধিত হেত্বাভাস বলে,

হেত্বাভাস আলোচনার ন্যায় দার্শনিক গণ কেবলমাত্র অনুমানের হেতুকে যথার্থ ভাবে নির্ণয় করার জন্যই উপস্থাপিত করে ছিলেন। তাই কোনো অনুমানের হেতুকে জানতে গেলে তার হেত্বাভাসকেও জানা প্রয়োজন,

বৌদ্ধ দর্শন

প্রতিষ্ঠাতা - গৌতম বুদ্ধ

শ্রেণি - নাস্তিক

প্রমাণ - দুটি - (i) প্রত্যক্ষ
(ii) অনুমান

প্রধান গ্রন্থ - ত্রিপিটক - বিনয়, সুত্ত, অভিধর্ম

শাখা - দুটি - (i) হীনযান
(ii) মহাযান

(i) আর্যসত্য কী? আর্য সত্য কয়টি ও কী কী? চতুর্থ আর্যসত্যের আলোচনা করো।

→ গৌতম বুদ্ধ তার তপস্যার শেষ দিনে চারটি প্রহরে যে চারটি মহান সত্য লাভ করেছিলেন তাকে বলা হয় আর্য সত্য।

আর্য সত্য চারটি যথা - (i) জগতে দুঃখ আছে
(ii) দুঃখের কারণ আছে
(iii) দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব
(iv) দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে।

(i) চতুর্থ আর্য সত্য

চারটি আর্য সত্যের মধ্যে চতুর্থ আর্য সত্যটি হল দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। গৌতম বুদ্ধ দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হিসাবে আটটি পথের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই আটটি পথকে একত্রে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'।

(ii) অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্বন্ধ

বুদ্ধদেব তার দর্শনে যে আটটি পথের উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল - (i) সৎদৃষ্টি (ii) সৎসংকল্প (iii) সৎ বাক্য (iv) সৎকর্ম (v) সৎ আজীব (vi) সৎ ব্যায়াম (vii) সৎস্মৃতি (viii) সৎসমাধি।

(i) সৎ দৃষ্টি : আর্য সত্য চতুষ্টয়ের প্রথম এবং যথার্থ জ্ঞানই হল সম্যক দৃষ্টি। অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান দুঃখের মূল কারণ, এই অবিদ্যা থেকেই মুক্ত হওয়ার জন্য চারটি আর্য সত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করাকেই সৎ দৃষ্টি বলে।

(ii) সৎ সংকল্প : সৎ দৃষ্টি বা সত্য জ্ঞান লাভ করে সেই মতো জীবন যাপনের প্রতিজ্ঞা করাকেই সৎ সংকল্প বলে।

(iii) সৎ বাক্য : মিথ্যা ভাষণ পরিহার করে সদা সত্য কথা বলাকেই সৎ বাক্য বলে। মিথ্যা কথা, কটু বাক্য, পরনিন্দা, ইত্যাদি পরিহার করাকেই সৎ বাক্য বলা হয়।

(iv) সৎ কর্ম : সৎ আচরণকেই সৎ কর্ম বলা হয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্যের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অহিংসা ও করুণার দ্বারা পরিচালিত হওয়াকেই সৎ কর্ম বলে।

(v) সৎ আজীব : সৎ উপায়ে আজীবন জীবিকা নির্বাহ করাকে বলা হয় সৎ আজীব, প্রাণী শিকার প্রাণী হত্যা মদ্য বিক্রয় প্রভৃতি বৃত্তি সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে সৎজীবিকা গ্রহণ করায় সৎ আজীব।

(vi) সৎ ব্যায়াম : সৎ চিন্তা ও সৎ প্রবৃত্তির অনুশীলন করাই হল সৎ ব্যায়াম। সৎ ব্যায়াম চারটি যথা— (i) কুচিন্তার উৎপত্তি বিনাশ। (ii) কুচিন্তা বিনাশ (iii) সৎ চিন্তার উৎপাদন (iv) সৎ চিন্তা সংরক্ষণ।

(vii) সৎ স্মৃতি : আর্যসত্য চতুষ্টয়ে সৎজ্ঞান সর্বদা স্মরণে রাখায় হল সৎ স্মৃতি, এই প্রকার স্মৃতির ফলে জগৎ ও জীবনের যথাযথ সৎ উপলব্ধি হয় এবং নির্বাণের পথ সুগম হয়।

(viii) সৎ সমাধি : উল্লিখিত সাতটি অঙ্গ যথাযথ অনুসৃত হলে সাধকের চিত্ত প্রশান্ত হয়, এবং সে সমাধির সামর্থ্য লাভ করে, এই সমাধিতেই নির্বাণ লাভ হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের অষ্টাঙ্গিক মার্গ জনসমাজে মেনে চলা আজও আবশ্যিক বলে গৌতম বুদ্ধ এই মার্গের প্রথম ও শেষ দুটি মার্গ মেনে চলার জন্য সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে অনুরোধ করেছেন।

(2) বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ ব্যাখ্যা সহ বিচার করো ?

— নির্বাণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল নিভে যাওয়া বা নির্বাপিত হওয়া। বুদ্ধদেব তার দ্বিতীয় আর্যসত্যে বলেছেন দুঃখের কারন আছে। সুতরাং দুঃখের নিবৃত্তি হওয়াও সম্ভব বুদ্ধদেব বলেন দুঃখের যদি কারন থাকে তবে সেই কারন দূর করলেই দুঃখ দূর হবে। বুদ্ধদেব বলেন কামনা বাসনাকে জয় করতে পারলেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব হয়।

নির্বানের স্বরূপ : নির্বানের স্বরূপ নিয়ে বৌদ্ধ দর্শনে মত পার্থক্য রয়েছে, নির্বাণকে কেন্দ্র করে যে প্রধান চারটি মত ভেদ দেখা দিয়েছে সেগুলি নিম্নলিখিত।

(i) অস্তিত্বের পূর্ণ বিলুপ্তি : কেউ কেউ মনে করেন নির্বাণ হল অস্তিত্বের পূর্ণ বিলুপ্তি অর্থাৎ ব্যক্তিগত সত্তার চিরন্ত বিলুপ্তি।

(ii) নির্বাণ অবর্ণনীয় অবস্থা : কেউ কেউ মনে করেন নির্বাণ হল একটি অবর্ণনীয় অবস্থা। নির্বাণ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির অবস্থা ঠিকই কিন্তু এই অবস্থা ঠিক মানুষের দেহের মধ্যে কখনোই ব্যাখ্যা করা যায় না, তাই নির্বাণ অ-বর্ণনীয় অবস্থা।

(iii) নির্বাণ আনন্দময় অবস্থা : কেউ কেউ বলেন নির্বাণ হল এক স্থিতিশীল আনন্দ পূর্ণ এবং শান্ত অবস্থা। যারা নির্বাণ লাভ করেন তাদের আর জন্ম হয় না, তাই তারা জোড়া, ব্যাধি এবং মৃত্যু এ থেকে মুক্তি পায়। এবং আনন্দ পূর্ণ অবস্থায় বিরাজ করে।

(iv) নির্বাণ অপরিবর্তনীয় অবস্থা : নির্বাণ হল একটি অপরিবর্তনীয় বিষয় এই অবস্থা যদি কোনো প্রকারের সৃষ্টি করা যায় তা হলে তার কোনো দিন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ এই অবস্থা অদ্ভুত পূর্ব এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থা।

নির্বাণ কথাটির অর্থ যদি পূর্ণ বিলুপ্তি হয় তাহলে বলতে হবে যে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পূর্বে নির্বাণ লাভ করেননি। সুতরাই নির্বাণ হল মনের এক বিশেষ অবস্থা, লাভ করেছেন তিনি পবিত্রভাবে ইহ জীবনে থেকে ম...

চার্বাক দর্শন

প্রতিষ্ঠাতা – বৃহস্পতি / শ্রেণি – নাস্তিক

অর্থ – চারু + বাক্ = চার্বাক

প্রিয় + কথা = প্রিয়বাক্য

প্রমাণ – প্রত্যক্ষ ~~মহাভূত~~

মহাভূত – চারটি – ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ

স্বীকৃত – চারটি মহাভূত, প্রত্যক্ষ প্রমাণ

অস্বীকৃত – অনুমান, উপমান, শব্দ, ব্যোম, ঈশ্বর, পরলোক, স্থায়ী আত্মা।

সম্প্রদায় – তিনটি – ধূর্ত চার্বাক, বৈতণ্ডিক চার্বাক, সুশিক্ষিত চার্বাক

① চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ কী? 'প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ' যুক্তিটি ব্যাখ্যা সহ ~~[illegible]~~ বিচার করো।

→ চার্বাকদের বলা হয় প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী, অর্থাৎ চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ যখন কোনো ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোনো বিষয়ের সংযোগের ফলে কোনো যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন তাকেই বলা হয় প্রত্যক্ষ। চার্বাক সম্প্রদায় ছাড়া অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় অনুমান, উপমান ও শব্দকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন কিন্তু চার্বাকরা অন্যান্য প্রমাণগুলিকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন তার জন্য তারা কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন যা নিম্নে বর্ণিত হল —

প্রথম যুক্তি : চার্বাক মতে প্রত্যক্ষ হল যথার্থ অনুভব, অনুভব হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ~~[illegible]~~ বিষয়ের সংযোগ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানই হল ~~অভিজ্ঞতা~~, অনুভব, প্রত্যক্ষকে বাদ দিলে কখনই যথার্থ অনুভব উৎপন্ন হয় না তাই চার্বাকদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

দ্বিতীয় যুক্তি : প্রত্যক্ষ হল সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ কথার অর্থ হল সংশয় শূন্য ও বিপর্যয় শূন্য, প্রত্যক্ষের দ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান সর্বদাই সংশয় শূন্য ও বিপর্যয় শূন্য হয় তাই চার্বাকরা প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেছেন।

তৃতীয় যুক্তি : চার্বাক মতে অনুমান প্রমাণ নয়, কারণ যে বিষয়ে আমরা অনুমান করি সেই বিষয়ের জ্ঞান আগে যেকোনো প্রত্যক্ষ করা হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষকেই বাদ দিলে অনুমান সম্পন্ন হতে পারে না। তাই চার্বাকরা বলেন অনুমান যেহেতু প্রত্যক্ষ নির্ভর সেহেতু অনুমান বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলা উচিত।

চতুর্থ যুক্তি : চার্বাক মতে ~~অনুমান~~ উপমান প্রমাণ নয় উপমান হল অনুমান থেকে উৎপন্ন থেকে উৎপন্ন জ্ঞান অনুমান ~~[illegible]~~ যেহেতু প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল সেহেতু উপমান ~~[illegible]~~ পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষের উপরেই নির্ভরশীল তাই চার্বাকরা উপমান — কে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলেছেন।

পঞ্চম যুক্তি : আপ্ত পুরুষের মুখনিঃসৃত বাণীকে শব্দ বলে, চার্বাকরা বলেন এই বিষয়ে কোনো আপ্ত পুরুষের আমরা কখনো প্রত্যক্ষ করিনি তাই শব্দকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার না করে প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা উচিত।

মন্তব্য : উপরিউক্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমর্থিত যুক্তি গুলি সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণও সঠিক জ্ঞান প্রমাণ নয় তাই চার্বাকের প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাথে সাথে অনুমান উপমান এবং শব্দকে প্রমাণ